অর্থনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উপর কভিড-১৯ এর প্রভাবঃ
সামাজিক নিরাপত্তা আলোচনায় অনুল্লেখিত কিছু দিক

কয়েকটি বিষয়কে ঘিরে পত্র-পত্রিকায় কভিড-১৯ এর আলোচনা হয়। সঙ্গতকারণে, সংক্রমণ-রোধের প্রায়োগিক দিক সেই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসাথে, আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের উপর প্রভাব, সম্ভাব্য প্রণোদনামূলক নীতিমালা এবং আপদকালীন সময়ে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য করণীয় বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নীতি-বাস্তবায়নে ব্যর্থতা তুলে ধরতে, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দূর্নীতি ও সুশাসনের বিবিধ দিকও আলোচনায় এসেছে। সেসবের বাইরে থেকে এনিবন্ধে সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মিশ্রিত অঙ্গণে চলমান পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করে নিকট-ভবিষ্যতকে বুঝতে চেষ্টা করবো। প্রাসঙ্গিক বিধায় অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। আশা করবো যে পাঠকদের ধৈর্য্য থাকবে।

২০১১ সনে ইউএনডিপি ও ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ণ-পরিকল্পনার তত্ত্বগত ভিত্তি নিরূপণের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি সম্মেলন করেছিল। সে অনুষ্ঠানের একটি সেশনে মূল উপাস্থপক হবার সুযোগ হয়েছিল। সম্পদ-মালিকানায় আমূল পরিবর্তন না এনে সমাজে বৈষম্য দূর করার তিনটি পথের উল্লেখ আমার উপস্থাপনায় করেছিলাম, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ।

- প্রথমত, রাষ্ট্রের মাধ্যমে, ধনীদের থেকে সংগৃহীত কর-রাজস্ব পুনর্বন্টন এবং অর্থ-সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকার-অর্জিত অর্থ-সম্পদ বিত্তহীনের মাঝে বণ্টন করে খানেকাংশে বৈষম্য দূর করা সম্ভব। এই পথের ভিন্ন একটি সংস্করণে, সরকার দেশের অভ্যন্তর থেকে অথবা বিদেশ থেকে দেনা করে (ধনীকে অধিক ধনী না করে) দরিদ্র জনসাধারনকে অধিক সহায়তা দিতে পারে। উল্লেখ্য যে দুটো পথের তাৎপর্য ভিন্ন, যদিও বাংলাদেশে উভয় ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থ এবং বৈদেশিক দেনা বিত্তবানদের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও অর্থ পাচারে সহায়তা করেছে, এবং রেমিটেন্স-প্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ নিশ্চিত করে সেই পাচারকে সম্ভব করেছিল।
- দ্বিতীয়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জন-সাধারনের শ্রম-সংস্থানের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদেরও আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করে বৈষম্যকে রোধ বা হ্রাস করা। উভয় মজুরী শ্রম ও স্বনিয়োজিত শ্রম-ব্যবহারের মাধ্যমে কর্ম-সংস্থান হতে পারে। এই পথেরও একটি ভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, যেখানে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের বিদেশে অস্থায়ী কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও দেশের জন্য বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন সম্ভব করা হয়।
- আয়-বৈষম্য হ্রাসের তৃতীয় পথটি অভিনব এবং পরিমার্জিত জ্ঞানের মোড়কে বিজ্ঞজনদের উপস্থাপনায় দ্বিতীয় পথের সাথে তার ভিন্নতা অদৃশ্য রয়ে যায়! প্রাথমিক উৎপাদন ও সম্পদ-মালিকানা থেকে অর্জিত আয় (সঞ্চয় বাদ দিলে) অর্জনকারীর বিবিধ ভোগ মেটাতে ব্যয় করা হয়। এসব ভোগদ্রব্যের অনেকগুলোই প্রাথমিক উৎপাদন-কার্যের ফসল। কিন্তু মোট ভোগের একটি উল্লেখজনক অংশ সেবাধর্মী, যা দৈনন্দিন জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনতে সহায়ক এবং কার্যত দরিদ্র জনসাধারনের শ্রমের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সেজাতীয় ভোগ তাদের আয়-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে আজকের মুখ্য আলোচনা, যা সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বাহ্যিকভাবে আয়-বৈষম্য কমা অথবা দরিদ্র জনসাধারনের আয়বৃদ্ধি বা দারিদ্র্য হার কমা উপরোক্ত তিনটি পথের (বা তন্মধ্যের উপপথের) দ্বারা অর্জন সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয়টিকেই সম্মানজনক পথ হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং সেই পথের উপর ভিত্তি করে দিল্লী সম্মেলনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাবনা রেখেছিলাম। সরকার-মুখাপেক্ষিতা (প্রথমটিরে ক্ষেত্রে) এবং 'মনিব' বা 'নিয়োগকর্তা'-মুখাপেক্ষিতা (তৃতীয়টির ক্ষেত্রে) আমাদের সমাজকে সেই সম্মানের জায়গায় পৌঁছানোর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আরও উল্লেখ্য যে উপরোক্ত বিশ্লেষণ-কাঠামোয় সরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সহ বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এনিবন্ধে অবশ্য শুধুমাত্র করোনাকালে 'মনিব'-মুখাপেক্ষিতার তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। এর বাইরে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির নেতা-মুখাপেক্ষিতা যেমন আন্তর্জাতিক শক্তিবলয়ের অধীনস্ত

হবার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, একইভাবে সরকার-মুখাপেক্ষিতার সাথে বৈদেশিক ঋণ-বৃদ্ধির যোগসূত্র রয়েছে। এ দুটো বিষয়ই এ নিবন্ধের আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজ গবেষণায় স্বপন আদনান-এর নামটি সুপরিচিত। তিনি সত্তুরের দশকের শুরুতে দাবী করেছিলেন যে সেসময়কার গ্রামীণ সমাজে মার্ক্সীয় ধারায় শ্রেণীবিভাজন না ঘটে লম্বালম্বি সংযুক্তির (ভার্টিক্যাল ইন্টেগ্রেশন-এর) প্রাধান্য ছিল। অর্থাৎ, একজন ধনী বা মোড়ল-শ্রেণীর ব্যক্তি বা পরিবারের সাথে অনেক গরীব পরিবার সামাজিকভাবে সংযুক্ত ছিল, যে কারণে সামাজিক বিরোধ মূলত এক বাড়ীর সাথে অন্য বাড়ীর অথবা এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধরূপে সংগঠিত হোতো। সম্ভবত সে কারণেই ষাট ও সত্তুর দশকের অতি বামদের 'শ্রেণীশত্রু-বিরোধী' আন্দোলন কখনই সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পাইনি।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে ব্যাপক অর্থনীতিক বিবর্তন এসেছে এবং ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ও শ্রম-রপ্তানীর কারণে আমাদের গ্রাম-সমাজের প্রচলিত বাঁধন অনেকটাই ভঙ্গুর হয়ে আসে। কিন্তু, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শহুরে জীবনযাত্রায় 'মনিব' বা 'নেতা'-মুখাপেক্ষিতা রন্ধ্রেরন্ধ্রে গেঁথে বসে, যা অদৃশ্য (করোনা) ভাইরাসের আক্রমণে আজ কিছুটা নড়বড়ে ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। এই দূর্যোগকালে পরজীবী-পুষ্ট সমাজ পাল্টে আমরা সভ্য ও সুশীল হবো, না কি, নিম্নস্তরের সামাজিক ভারসম্যে নিমজ্জিত হবো, সেটা আমাদের নেতৃত্বের জ্ঞান (ও তথ্য)-ভিত্তিক কৌশল নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। সে ব্যাপারে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ না পেয়ে একটি অনুল্লেখিত বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ব্যাখ্যা না দিয়েই প্রস্তাবনাকারে মত দিচ্ছি। আমাদের সমাজে ন্যুনতম তিন শ্রেণীর পরজীবী আছে, (১) আন্তর্জাতিক পুঁজির সহায়ক হিসেবে তাদের ঋণ-পুষ্ট প্রকল্প অথবা প্রোকিউরমেন্টের (আহরণ কর্মের) সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সমাজের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্নদের একাংশ, (২) দেশের অভ্যন্তর থেকে আইন-বহির্ভূত পথে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা ব্যক্তি-আয় অর্জন বা তা বৃদ্ধি করে, এবং (৩) উল্লেখিত দুই শ্রেণীর লোকসহ বিপুল সংখ্যক উপার্জনকারী, সঞ্চয় ভাঙ্গিয়ে চলা অবসর যাপনকারী, ও রেমিটেন্স-নির্ভর পরিবারের সদস্যদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌখিনতা নিশ্চিত করতে যারা বিভিন্ন ধরণের সেবা দেন। লক্ষণীয় যে, পরজীবী কথাটি ব্যবহার করলেও তা পূর্নাঙ্গ অর্থ বহন করে না, কারণ, এরা নির্দিষ্ট পরস্পর-নির্ভরশীল সম্পর্কের একটি দিক মাত্র।

এনিবন্ধে কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর 'পরজীবী'দের উল্লেখ করা হয়েছে। বাসা ও অফিসে মেশানো শহুরে জীবনে বিত্তবানদের সৌখিনতা নিশ্চিত করতে বিশেষ কয়েকটি সেবা সচরাচর দেখা যায়। বাসায় রান্না ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য গৃহকর্মী, চলাচলে সহায়তা করার জন্য গাড়ীর চালক, দালানের দেখভাল করবার জন্য নিরাপত্তা কর্মী ও কেয়ারটেকার। অফিসের কাজে রয়েছে বয়-বেয়ারা, অতিরিক্ত মেসেঞ্জার,ইত্যাদি। এই সেবাকর্মীর তালিকায় কেউকেউ রিকশাচালককে অন্তর্ভুক্ত করবেন, কারণ তারাও অবস্থাপন্নদের জীবনে (অনেকক্ষেত্রে, অনাবশ্যিক) অথবা যেসকল কর্মীরা বিত্তবানদের সেবা দেন তাদের যাতায়তে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে সহায়তা করে।

এনিবন্ধটি লিখতে বসে উপলব্ধি করছি যে এসব 'মনিব'-নির্ভর সেবাকর্মীদের যে বেতন-ভাতা বা পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (বিবিএস জরীপে) ভোক্তার (খানা) খরচে ধরা পড়ে না। যে সমাজ ও অর্থনীতিতে কর ফাঁকি-দেয়া অর্থের আধিক্য থাকে এবং নগদে সেবা-ক্রয় সহজ, সেখানে এজাতীয় ব্যয় কাগজে-কলমে অদৃশ্য রয়ে যায়। রাজনীতির অঙ্গণেও অনুসারীদের ভরণ-পোষণের হিসেব দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়। তাই জাতীয় জরীপ থেকে আমার প্রস্তাবনার পক্ষে বা বিপক্ষে তথ্য দেয়া দুষ্কর। তথাপি, চলতে ফিরতে শহুরে জীবনের প্রতিটি পদে উল্লেখিত সেবাকর্মীদের চাক্ষুষ দেখলে তথাকথিত এভিডেন্স-এর প্রয়োজন হয়না।

অধিকাংশ উন্নত দেশে কেবল উচ্চবিত্তদের পক্ষে এজাতীয় সেবা পাবার সুযোগ ছিল। সে তুনলনায় দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে সমাজ ও সংস্কৃতি 'বাঙ্গালি বাবু'র সমতুল্য মধ্যবিত্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় সমাজ ও অর্থনীতিক সংগঠনে মনিব-নির্ভর সেবাকর্মী ও সেবা-নির্ভর বাবুদের পরস্পর-নির্ভরশীলতা প্রকটভাবে নজরে পড়ে। এই বাঁধুনি যেমন সমাজকে একধরণের স্থিতিশীলতা দেয় ও একজনের আয় অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি এর মাধ্যমে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক সম্পর্ক স্থায়িত্ব পায়। সেবাকর্মীর সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে, সেসম্পর্কে বেঁচে থাকার জন্য অন্যের গোলামী করতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মনিবের স্বার্থ-রক্ষার্থে জীবন-পণ করতে হয়। বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান মেটাতে

সরকার-নির্ভরতা বা রাজনীতিতে নেতা-নির্ভরতা সামাজিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেই তুলনায়, সমাজ-অর্থনীতিতে, বিশেষত তথাকথিত কর্পোরেট জগতে, এই লম্বালম্বি সংযুক্তি (ভার্টিক্যাল ইন্টেগ্রেশন)-ভিত্তিক নির্ভরশীলতা অগ্রগতিতে কোনক্রমে কম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বিশেষত, অনেকেই যে আলোকিত এলিট (অভিজাত)-এর অপেক্ষায় থাকেন সেই এলিটদের বিকাশ অংকুরে বিনষ্ট হয় দল-পুষ্ট সেবা-নির্ভর বিত্তবানদের নোংরামি ও আগ্রাসী কর্মকান্ডে। আমাদের সমাজে ব্যাংক-লুটেরাদের "দাতা" হিসেবে আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত কম নয়। একই রকমের ছবি সরকার-নির্ভর ও নেতা-নির্ভর সংস্কৃতিতেও দেখা যায়। এমনকি ঔষুধ ও টেষ্ট-কিটকে কেন্দ্র করে সদ্য ঘটে যাওয়া রাজনীতিক-অর্থনীতি, কর্পোরেট জগতে লম্বালম্বি সংযুক্তির ইঙ্গিত দেয়, যা বিশ্ব-পরিসর পর্যন্ত বিস্তৃত।

শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে অদৃশ্য সার-করোনা-২ ভাইরাসের আগমনে পুরনো সম্পর্কগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। আক্রান্ত আপনজনকে বাইরে ফেলে রাখার মত অমানবিক ঘটনা আমি ব্যতিক্রমী মনে করি, যার পেছনে অজ্ঞতা ও ভীতি কাজ করেছে। কেবল (সামষ্টিক) সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক সম্পর্কের প্রতি নজর দিলে, কয়েকটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। অবস্থাপন্নদের মধ্যকার দয়ালু ব্যক্তিরা আগের মত রাস্তাঘাটে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন না। প্রয়োজন থাকা সত্বেও অস্থায়ী গৃহকর্মীদের বাসায় আসতে দিতে এখন অনেকেই দ্বিধান্বিত। এরা নিজেদের বাসা থেকে এসে কাজ করে বিধায় অনেকেই সংক্রমণের আশংকা করে। একই শংকা গাড়ীর চালকের জন্যও প্রযোজ্য এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সেবাকর্মীদের উপর নির্ভরশীলতা দূর করার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। নিজ বাসায় গাড়ীর চালক বা গৃহকর্মী রেখে সেবাপ্রাপ্তি চালু রাখার সামর্থ্য অধিকাংশ মধ্যবিত্তের নেই। ব্যতিক্রম দেখা যায় এপার্টমেন্ট ভবনের নিরাপত্তা কর্মীদের ক্ষেত্রে। অনেকেই, বিশেষত অনভিপ্রেত ঘটনার আশংকায়, তাদের জন্য নিজ-প্রাঙ্গণে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে, যা তাদের স্বাধীনতা কমালেও সাশ্রয় এনেছে। কিছুটা ভিন্ন হলেও অফিস-আদালতে নিম্ন-আয়ের কর্মচারীদের কাছ থেকে স্বল্প-দূরত্ব থেকে সেবা নিতে অবস্থাপন্নরা দ্বিধাবোধ করবেন। পেপার-বিহীন ও শারীরিক-দূরত্ব রক্ষা করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের সরকারী নির্দেশ কোনও একদিন কার্যকর হলে হয়তো নিম্ন-আয়ের অনেকেই নতুন প্রযুক্তি-পরিবেশে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়বেন। কভিড-পরবর্তী সমাজ যে অধিক প্রযুক্তি-নির্ভর এবং কমমাত্রায় অদক্ষ শ্রম-নির্ভর হবে, তা অনেকেই স্বীকার করেন। তবে সেই পর্যায়ে পৌঁছুনোর আগেই হয়তো নতুন ভাইরাসের কারণে বাইরে থেকে আসা গৃহ-কর্মীদের মত অনেক নিম্ন-আয়ের ও স্বল্প দক্ষতার অফিস-কর্মীরা কর্ম-অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবেন।

আমার জানামতে, অনেক বাসাতেই খন্ড-কালীন গৃহকর্মীদের বেতন দেয়া হচ্ছে। এর পেছনে মানবিক কারণ যেমন রয়েছে, আবার অনেকেই অতীতের স্বাভাবিক জীবন ফিরবে আশা করে বিশ্বস্ত সেবাকর্মীদের ধরে রাখতে চায়। একইভাবে বহু বেসরকারি অফিস, শোনা যায়, আংশিক হলেও কর্মচারীদের বেতন দেয়া অব্যহত রেখেছে। ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপের একটি সদ্য-সমাপ্ত গবেষণা থেকে জানা যায় যে এই চর্চ্চা বড়জোর সেপ্টেম্বর অবধি চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে এবং অর্ধেকেরও বেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতি গড়ালে কি হবে ভাবতেই পারছে না। তবে টিকে থাকার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্ম-পদ্ধতিতে ও নিয়োগ-নীতিতে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নিয়েছে।

উপরের বর্ণনা থেকে অনুধাবনযোগ্য যে অদৃশ্য ভাইরাসটি আমাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের একটি অতি-পুরাতন সম্পর্ককে আঘাত হেনেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এই সম্পর্কটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেছে। এই দূর্যোগপূর্ণ সময়ে ব্যক্তিখাতের অপারগতায় অথবা প্রতিষ্ঠানিক রূপান্তরের ফলে পুরনো মনিব (নিয়োগকারী)-সেবাকর্মীর সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে সরকারের উপর সামাজিক নিরাপত্তার দায়ভার অধিক বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে এটাই উপযুক্ত সময়, সমাজ ও অর্থনীতিক সংগঠনের গুণগত পরিবর্তন আনা যা পরবর্তীতে সামাজিক সম্পর্ককে সম্মানজনক অবস্থানে নিতে পারবে। এই উভয়সংকট বিশিষ্টজন ও নীতি-নির্ধারকদের মাঝে স্বীকৃত হলেই সমাধানের সম্ভাব্য পথ নিয়ে আলোচনা অর্থবহুল হবে। সাধারণভাবে উল্লেখ করবো যে, ব্যক্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেয় সেবার মান ও দাম বৃদ্ধি পেলে সেকাজে পেশাদারিত্ব আসবে এবং সম্পর্কের সম্মানজনক রূপান্তর ঘটবে। এই খাত থেকে ঝরে পড়া শ্রমকে সমষ্টির উন্নয়ন-কর্মে (যেমন, নদী-খনন) নিযুক্ত করার সুযোগ প্রশস্ত করতে হবে। আশা করবো যে বিভ্রান্ত না হয়ে অথবা কর্পোরেট-স্বার্থের বেড়াজালে আটকে না পড়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব উন্মুক্তমনা পেশাদারিত্বকে অঙ্গীভূত করে সমাজ ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিবেন।

সাজ্জাদ জহির, নির্বাহী পরিচালক, ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপ, ১ লা জুন ২০২০
[মতামত লেখকের নিজস্ব এবং সে'মতের সাথে ইআরজি-এর অন্যদের মতের অভিন্নতা নাও থাকতে পারে।]